Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসে আদিবাসী সমাজজীবন

ড. হরিচন্দ্র দাস

Link : https://bit.ly/47NERik

সারসংক্ষেপ : নানা ধর্ম বর্ণের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে মিলন মহান ভারতবর্ষ। অথচ ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজ চিরকাল বঞ্চিত শোষিত নানা ভাবে। তাদের শোষণ বঞ্চনা দারিদ্র্যের কথা বিভিন্ন সাহিত্যে উঠে এলেও আদিবাসী সমাজের গৌরবগাথা ও প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা সাহিত্যে সেরকম উঠে আসেনি। একসময় ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খুব আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন সাহিত্যে আদিবাসী সমাজজীবনের ইতিবৃত্ত উঠে না আসার জন্যে। এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম কথাশিল্পী, যিনি অসাধারণ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি, অনুভূতি ও সহমর্মিতায় আদিবাসী আর্থ-সামাজিক জীবনের অনেক অজানা কথা তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যরাজিতে। আমাদের আলোচিত ‘‘আরণ্যক’’ উপন্যাসে আরণ্যক জীবনে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষের অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি যেমন সহৃদয়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন, তেমনি অর্থনৈতিক দূরবস্থায় জমিদার মহাজনদের সর্বগ্রাসী লোভের শিকার হয়েছেন। কিন্তু আদিবাসী সমাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধময় জীবনের কথা তুলে ধরেন নি। অনেকক্ষেত্রে লেখক হয়তো এড়িয়ে গেছেন। অথচ বিরাট অবকাশ ছিল আদিবাসী সমাজের প্রতিরোধময় জীবনকে তুলে আনার...!!

সূচক শব্দ : আদিবাসী, ভারতীয়করণ, ট্রাইব, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, নৃতাত্ত্বিক, স্মৃতিরেখা, নিম্নবর্গ, সংহতিবোধ

নানা ধর্ম-বর্ণের রীতি-নীতি-বিশ্বাস-সংস্কৃতি আচার-সংস্কারের সমন্বয়ে গঠিত ঐতিহ্যবাহী ভারতাত্মা ভারতবর্ষ। আর্য-অনার্যের সংঘাত-সমন্বয়ে পারস্পরিক আদান-প্রদানে-সংমিশ্রণে এবং নানা মনীষীর আবির্ভাব ও শুদ্ধিকরণে গড়ে উঠেছে মহামানবের পবিত্রভূমি মিলনতীর্থ ভারতভূমি। কবিগুরুর কথায় —

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে, সমুদ্র হলো সারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন।[১]

সাধারণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবান্বিত অধ্যায় ধরা হয় আর্য জাতির বা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর। তাদের স্থানিক ও আত্মিক যোগ যতই গৌরবান্বিত হোক না কেন, এখানে বহু উপেক্ষিত পতিত, ব্রাত্য জনজাতি আদিবাসী সমাজ। এক্ষেত্রে মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, ‘আদিবাসী’ বলতে কাদের বোঝায়? ভারতবর্ষের আদি বসবাসকারী মানুষই আদিবাসী। নৃতাত্ত্বিক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন — ‘‘আর্যপূর্ব ভারতের আদিম বাসিন্দা তারাই। আর্যদের ভারতে আগমন ও বসতি বিস্তারের ফলে তারা বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আর্যরা তাদের নিজের বসতস্থল থেকে বিতাড়িত করে।’’[২]

আদিম অধিবাসী অর্থে ‘আদিবাসী’ শব্দের ব্যবহার নৃতাত্ত্বিকেরা সকলেই স্বীকার করেন। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ শাসনের আগে ‘আদিবাসী’ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। ইংরেজি ‘ট্রাইব’ শব্দের ভারতীয়করণ করা হয়েছে, আদিবাসী, জনজাতি, উপজাতি ইত্যাদি। যাই হোক, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আদিবাসীরাই সমৃদ্ধ করেছে একথা একবাক্যে স্বীকার করতেই হবে। অথচ অনার্য জনজাতির ইতিহাস পঙ্কিল ও অনাদিকাল থেকে অন্ধকারাচ্ছন্নই রয়ে গেছে। জনৈক আলোচক বলেছেন —

‘‘আর্যভাষীরা তাঁদের আদর্শায়িত জগত ও জীবনের কথা বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখানে অনার্য জাতির

যেটুকু ইতিহাস তা তাদের পঙ্কিল ও অন্ধকারচ্ছন্ন জগৎ ও জীবনযাত্রা প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত অধর্ম অনাদর্শ তথা সভ্যজগৎবহির্ভূত হিংসক্ চেহারা বা বর্বরতার নগ্নচিত্র ছাড়া অধিক কিছু নয়। আর্য সাহিত্যে অনার্যদের নীচতা-স্বার্থপরতা, পরপীড়ার মত হীনবাসনা, বীভৎসচেতনা তথা অনার্যজাতির উপর আর্য জাতির অত্যাচার-শোষণ, বঞ্চনা-প্রতারণার কথা প্রকাশ পেলেও বিপরীতে অন্-আর্যদের ক্ষোভ প্রতিবাদ ও গৌরবের দিকগুলি প্রকাশ পায়নি।"[৩]

উদ্ধৃত মন্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় আদিবাসীদের দুর্ভিক্ষ-মহামারী-মড়ক, বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, স্থানান্তরকরণ প্রভৃতি তাদের অর্থনৈতিক ইতিহাস। যাই হোক বর্তমান আদিবাসীদের ঐতিহাসিক উপাদান পৌরাণিক কাহিনি, গল্পগাথা, সংগীত-শিল্পকলা ও তাদের আচার-আচরণে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকা, সরকারি রিপোর্ট, নৃতাত্ত্বিকদের বিবরণ, দলিল-দস্তাবেজ ও দেশী বিদেশী অনুসন্ধিৎসু গবেষক-পর্যবেক্ষকদের লিপিবদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান আদিবাসী সমাজ জীবনের ইতিকথা জানতে পারা যায়।

ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রই জানেন পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে বর্গী মারাঠা প্রভৃতি বহিরাগত দস্যুদের হাঙ্গামায় বাংলার সমাজ জীবন যখন নানাভাবে বিপর্যস্ত, আদিবাসীরা তখন অরণ্য অভ্যন্তরে গোপন পথ সন্ধানে — উৎকোচের ঘৃণ্য প্রস্তাব প্রখর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। মূলত তাদের অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তায় 'দিকু' ইংরেজদের কাছে শস্য তারা বিক্রি করেনি। ইংরেজদের শোষণ-পীড়ন বঞ্চনা আদিবাসী সমাজের বুকে চরম আঘাত হানলে আদিবাসী সমাজ তাদের স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন-মান অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্রোহী হয় — সাঁওতাল বিদ্রোহ, রিয়াং বিদ্রোহ, রাম্পা বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ প্রভৃতি সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করে। বলা বাহুল্য আদিবাসীরা মূলত ভূমিকে কেন্দ্র করেই উক্ত বিদ্রোহগুলি সংঘটিত করেছে। "ভারতের সামন্ততান্ত্রিক আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুষ্ট তথা ইংরেজ শাসক বর্গের প্রশ্রয়ে জমিদার-মহাজন-পুলিশ-ঠিকাদার আড়কাঠিদের অত্যাচার-খাজনা, শ্রমশোষণ ও তাদের জঘন্য স্বার্থপরতার শিকার আদিবাসী সমাজ ক্রমে 'শ্রমদাস'এ রূপান্তরিত।"[৪] ভারতীয় মূল আদিবাসীদের উপর বহিরাগত আর্যজাতির অত্যাচার শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণার কথা প্রকাশ পেলেও মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে আদিবাসীদের ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও গৌরবের দিকগুলি প্রকাশ পায়নি।

আদিবাসীদের প্রকৃত ইতিহাস তুলে না ধরার মতো যে অবজ্ঞা বা ঘৃণা তা উপলব্ধি করে কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদনাবোধ করেছেন তাঁর সাহিত্যরাজিতে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিরিখে বলা যায় বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী সমাজ জীবনের কাহিনি রূপায়ণের ক্ষেত্রে আরণ্যক ধারার অন্যতম কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি, অনুভূতি ও সহমর্মিতায় আদিবাসী সমাজের আর্থ-সামাজিক জীবনের অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। বিভূতিভূষণের পাঠকমাত্রই জানেন বিভূতিভূষণ গল্প উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিসীমা বাংলা ছাড়িয়ে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়েছে। জীবনে প্রথম পর্বে ও পরবর্তী সময়ে বাংলার বাইরে বিশেষত বিহারের ভাগলপুর পূর্ণিয়া এবং মধ্যপ্রদেশের অরণ্য অঞ্চলে লেখকের দীর্ঘকালীন বসবাস এবং ভ্রমণের সূত্রে তা অর্জিত। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের জানুআরি মাসে বিভূতিভূষণ খেলাত চন্দ্র ঘোষের ভাগলপুরস্থিত জঙ্গালমহলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হন। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

"বসবাস নয় তো বাড়ি ফেরা। বিভূতিভূষণের এই আরণ্যক পর্ব তাঁর আত্মোপলব্ধির এবং বিকাশের এক স্মরণীয় পর্ব।... ভাগলপুরের আরণ্যক পরবেই পথের পাঁচালী লেখা থেকে আরণ্যক দেবযান ইছামতি পর্যন্ত ভাবা। এক কথায় এই অরণ্যেই বিভূতিভূষণ তাঁর সাম্রাজ্যকে চিনে নিয়েছিলেন।"[৫]

এই অরণ্যবাস এবং পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি ভ্রমণের সূত্রে বিভূতিভূষণ অরণ্য সংলগ্ন আদিবাসী সমাজের মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ কারণে দেখা যায় 'আরণ্যক' (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসের কাহিনিসূত্র বিধৃত অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে ১৯২৮ সালের ১২ ফেব্রুআরি 'স্মৃতিরেখা' নামক দিনলিপি বা ভ্রমণ কাহিনিতে। এখানে বিভূতিভূষণ লিখেছেন —

"এই জঙ্গালের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি।"[৬]

আরণ্যক উপন্যাসে বিভূতিভূষণ আমাদের কাছে উন্মুক্ত করেছেন এক ভিন্ন জগতের দুয়ার — এনে দিয়েছেন ভিন্ন সমাজ জীবনের সংবাদ ও স্বাদ। বিহারের ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, নাড়াবইহার, লবটুলিয়া, বোমাইবুরু, আজমাবাদ, মোহনপুরা প্রভৃতি অরণ্য অঞ্চল তথা জঙ্গালমহলের আদিবাসী সমাজের নিম্নবর্গ মানুষের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ চিত্র যা সমকালে অন্য কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ লেখকের লেখনিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯২৪ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অরণ্য পরিবেশে গোঁড়, সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনকে দেখার সুযোগ হয়েছিল বিভূতিভূষণের।

সাধারণত অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী, খাদ্য, বাসগৃহ, বিশ্বাস-ধর্ম-দেবদেবী, ভাষা ইত্যাদি নিয়ে জীবন আচরণ ও জীবন বোধের অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রকৃতপক্ষে পাঠকের কাছে ভিন্ন জগতের স্বাদ এনে দেয়।

'আরণ্যক' উপন্যাসে দোবরু পান্না বীরবর্দীর পরিবারকে কেন্দ্র করে আদিবাসী জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক দিকের একটি রূপরেখিত ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। আদিবাসী সাঁওতালরা বিভূতিভূষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বেশি এসেছে। ফলত দোবরু পান্না বীরবর্দীর সাঁওতালদের অতীত সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে এবং সমগ্র পরিবারটি বহুলাংশে সাঁওতালি রূপ পেয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় আদিবাসীদের সামাজিক গঠন অনুসারে যৌথ পরিবারের কাঠামো — "...রাজার তিনটি ছেলে, তাহাদের আট দশটি ছেলেমেয়ে। এই বৃহৎ পরিবারের সকলেই এই গ্রামে একত্রে থাকে।"[৭]

সমগ্র পরিবার-সহ নিজের আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে দোবরু পান্নার। ভারতবর্ষের যে-কোনো আদিবাসী সমাজের মতোই দারিদ্র্য এদের নিত্য সঙ্গী। গোচারণ ও শিকারবৃত্তি সমগ্র পরিবারটির মুখ্য জীবিকা। উপন্যাসে মুটুকনাথ পর্যন্ত সবিস্ময়ে দোবরু পান্নার বিষয়ে বলেছে — "রাজা দেখেছি আমার চেয়ে গরীব।"[৮] স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগে মহাজনদের সর্বগ্রাসী লোভের শিকার হয়েছে আদিবাসী দোবরু পান্নার মতো পরিবারগুলি। দোবরু পান্নার মৃত্যুর পর রাজপুত মহাজন বীরবল সিংহ পরিবারটির গরু-মহিষ আটক করেছে। ইতিহাসের সূত্র ধরে আমরা জানতে পারি 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' কিংবা 'মুণ্ডা বিদ্রোহ'এর অন্যতম কারণ মহাজনদের ভয়ঙ্কর অত্যাচার। উপন্যাসে দেখা যায় দৈনন্দিন জীবনে আদিবাসী সমাজের ওপর মহাজনদের অত্যাচারের পাশাপাশি আরণ্যক পরিবেশে বাঘের উপদ্রব। যার থেকে গরু-মহিষ বাঁচানো আরো কঠিন। সাধারণত গরু-মহিষের দুধ বিক্রি করে অর্ধেক ব্যয় নির্বাহ করতে হয় আদিবাসী পরিবারটির। ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মহাজনের হাতে গরু-মহিষ আটক হলে আদিবাসীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে —

"মহাজনের দেনা এখনও শোধ হয় নাই, দুইটি মহিষ ধার করিয়া কিনিতে হইয়াছে। না কিনিলে চলে না, গয়ার এক মারোয়ারী মহাজন আগে আসিয়া ঘি কিনিয়া লইয়া যাইত — আজ তিন-চার মাস সে আর আসে না। প্রায় আধ মন ঘি ঘরে মজুদ, খরিদ্দার নাই।"[৯]

আরণ্যক উপন্যাসে বর্ণিত প্রতিফলিত আদিবাসী সমাজের মূল বৃত্তি পশুপালন, শিকার ও কৃষিকাজ। তারা অরণ্য প্রকৃতির কোলে বসবাস করে বস্তির খুপরির ঘরে, খড় কিংবা পাতায় ছাওয়া কুটিরে। তাদের প্রিয় খাদ্য শুটকি কুচো চিংড়ি, নালশে পিঁপড়ের ডিম, লাল পিঁপড়ের ডিম, মটর শাক, কাঁচা পেঁপে, শুকনো কুল, কেঁদ ফুল, পেয়ারা, বুনো সিম ইত্যাদি। অরণ্যদেশের আদিবাসীরা খেতে ভালোবাসে জংলি গুরমি ফল ভাজা, বাথুয়া শাক সিদ্ধ, বুনো ধুধুল ভাজা, কাঁকরোল ভাজা, মেটে আলু সিদ্ধ, মকাই ঘাটো, ভুট্টা, কন্দ ইত্যাদি। কিছু না পেলে চিনা ঘাসের দানা নুন দিয়ে খেতে অভ্যস্ত। আসলে যাযাবর আরণ্যক আদিবাসী মানুষদের চাষবাস বলতে চিনা ঘাস ও মকাই। বন্যদেশের আদি অধিবাসী সাঁওতালদের তৃপ্তিকর খাদ্য সজারুর মাংস। কথকের ভাষায় "এরা পশুর মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত।" আরণ্যক মানুষের খাদ্যের বর্ণনায় অরণ্য পরিবেশের সহজাত চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের কথক নন্দলাল ওঝার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে খাদ্যের যে তালিকা দিয়েছেন তা অরণ্যের গৃহস্থ আদিবাসী পরিবার সম্পর্কে আমাদের নতুন জীবনের স্বাদ এনে দেয় —

"থালায় হাতির কানের মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শসার রায়তা, কাঁচা তেতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া।"[১০]

উপন্যাসের পাঠকমাত্রই জানেন আরণ্যক উপন্যাসে গল্প কথক সত্যচরণের দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে অরণ্য সংলগ্ন আদিবাসী সমাজ জীবনের পরিচয়। মূলত দোবরু পান্না বীরবর্দীর পরিবারকে কেন্দ্র করে আদিবাসী সমাজজীবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসের সমগ্র একাদশ পরিচ্ছেদ জুড়েই আছে রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দীর সঙ্গে সত্যচরণের প্রথম সাক্ষাৎ এবং সেই আদিবাসী সমাজ জীবন সম্পর্কে গল্পকথকের প্রথম পাঠ। নবম পরিচ্ছেদে দশরথ সিং ঝাণ্ডাওয়ালা নামক এক রাজপুতের সঙ্গে বুনোমহিষ শিকার করার গল্প প্রসঙ্গে সেখানে উপস্থিত এক বৃদ্ধ সাঁওতালের মুখে বন্য মহিষের রক্ষক দেবতা টাঁড়বারোর কথা শোনা গেছে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলন উৎসব দোবরু পান্না বীরবর্দীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে সত্যচরণ তাঁদের বাসস্থলে গেছেন। যেখানে আছে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত উৎসবের কথা। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায় দোবরু পান্নার মৃত্যু সংবাদ শুনে এই আদিবাসী রাজপরিবারের প্রতি সত্যচরণের সহানুভূতিশীল মানসিকতা।

সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দী, তাঁর প্রপৌত্রী ভানুমতি, পৌত্র জগরু পান্না — এসব আদিবাসী চরিত্রই 'আরণ্যক' উপন্যাসের অরণ্য প্রকৃতির জীবন্ত প্রতিনিধি স্বরূপ। দোবরু পান্না বীরবর্দীর অতীত কথা সম্পর্কে সত্যচরণ যেসব

কথাবার্তা জানেন, তাতে অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা উঠে এসেছে, যদিও ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তোলেন নি। সত্যচরণ জানতে পারেন —

> আমরা শুনেছি উত্তরে হিমালয় পাহাড় আর দক্ষিণে ছোট নাগপুরের সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের — এই সীমানার মধ্যে সমস্ত পাহাড় জঙ্গালের রাজা ছিল ওঁর পূর্বপুরুষ।... মুঘল বাদশাহের আমলে এরা মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে — এই জঙ্গালের মধ্য দিয়ে তারা যখন বাংলাদেশে যেত — এরা উপদ্রব করত তীর-ধনুক নিয়ে। শেষে রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা। এখন আর কিছুই নেই যা কিছু বাকি ছিল, ১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সব যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা এখনো বেঁচে আছেন। তিনি বর্তমান রাজা। নাম দোবরু পান্না বীরবর্দী। খুব বৃদ্ধ আর খুব গরিব। কিন্তু এদেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।[১১]

সাঁওতাল বিদ্রোহে দোবরু পান্না বীরবর্দীর অংশগ্রহণ, তাঁর রাজধানীর মাটির ঘর, যার "দেওয়ালের গায়ে মাটির সাপ, পদ্ম, লতা প্রভৃতি গড়া।"[১২] ধনঝরি শৈলমালায় তাঁদের পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থান, শিকারের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য, উৎসবে মাদল বাজিয়ে নাচ-গান প্রভৃতি বিষয়গুলি আদিবাসী সমাজজীবনের লোকপ্রসঙ্গ।

অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে কিছু সংস্কার প্রথা লক্ষ্য করা যায়। মেয়েরা স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এলে প্রিয়জনের গলা জড়িয়ে 'মড়াকান্না' কাঁদে। যদি কেউ না কাঁদে তাহলে প্রমাণিত হয় সে স্ত্রীলোক বাবার বাড়ি অপেক্ষা স্বামীর ঘরে ভালো ছিল — এটি খুব লজ্জার ব্যাপার। মৃত্যুর পরে সাঁওতাল আদিবাসীরা মৃত ব্যক্তিকে পাহাড়ের উপর সমাধিস্থ করে। কথক পাহাড় অরণ্যের বুকে নানা ধরনের ভূত-প্রেত-পরীর উল্লেখ করেছেন। মূলত বন্যদেশের আদিবাসী মানুষদের বিশ্বাস ও লোকসংস্কারের ফলশ্রুতি। জ্যোৎস্না রাতে নির্জন বনের মধ্যে অল্প বয়সে সুন্দরী মেয়েরা হাত ধরাধরি করে নাচে যাদের লোকভাষায় 'ডামাবানু' বলে। তাদের কথায় এরা 'এক ধরনের জিন পরী'। বনের মধ্যে বুনোমহিষের দেবতা টাঁড়বারোর কাহিনিও অলৌকিক ঘটনার পর্যায়ভুক্ত মনে হলেও শিকারীদের হাত থেকে এই দেবতা বুনো মহিষকুলকে রক্ষা করেন। এই দেবতা মূলত সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের জাগ্রত দেবতা।

বনে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষ চিকিৎসার ক্ষেত্রে জড়িবুটি, শিকড়-বাকড় দিয়ে রোগীর রোগ সারাবার চেষ্টা করে। মূলত অরণ্য প্রকৃতির বুকে আদিবাসী সমাজে ডাক্তার নেই। ঔষধপত্র ও পথ্যের কোনো ব্যবস্থা নেই। শিকারের মাধ্যমে আরণ্যক মানুষ কঠোর জীবন সংগ্রামে অভ্যস্ত। এই সমাজের মানুষগুলি 'সাতনালি' ও 'আঠাকঠি' দিয়ে শিকার করে এবং অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙ্গি, তলোয়ার ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে আরণ্যক উপন্যাসের একদিকে ফুটে উঠেছে প্রকৃতিমুগ্ধ বিভূতিভূষণের গভীর সৌন্দর্যবোধ, অন্যদিকে অরণ্য প্রকৃতির বুকে সর্বহারা আদিবাসী যাযাবর মানুষের দুর্বিষহ জীবনগাথা। অরণ্য অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতাল, রাজগোঁড়, গাঙ্গোতা, ভুঁইহার, গোঁড়, বাঙন, মাহাতো প্রভৃতি আদিবাসী ও নিরন্ন অসহায় মানুষ অরণ্য প্রকৃতির বুকে নতুন নতুন টোলা গড়ে তুলতে চেয়েছে। জমিদার, মহাজন, ইজারাদাররা আদিবাসী সমাজ জীবনকে নানাভাবে শোষণ করে। তারা অরণ্যভূমিকে পরিষ্কার করে মানুষের বাসযোগ্য ও আবাসযোগ্য করে তুলতে প্রায় প্রয়াসী। ফলে নতুন কৃষি অর্থনীতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় ঠিকই। কিন্তু আদিবাসী ও অরণ্যের নিম্নকোটির মানুষরা বঞ্চিত হয় তাদের নিজস্ব অধিকার থেকে। অথচ আদিবাসী সমাজ এ বিষয়ে আদৌ অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। কেউ তাদের নেতৃত্ব দিয়ে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করায় না।

লক্ষণীয়, যাযাবর শ্রেণির মানুষদের মধ্যে সংহতিবোধ বা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা বা তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের রূপ প্রতিভাত হবার পূর্বেই বিভূতিভূষণ কাহিনি সমাপ্ত করেছেন। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অতি দুর্বল মানুষদের মধ্যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার থেকে — ভানুমতি, গনু মাহাত, গাঙ্গোতিন, কুন্তা, জগরু, মঞ্চী, সুরতিয়া, ধ্রুবা, নাটুয়া, দশরথ প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যে জাতপাতের বিষয়টি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। স্বাভাবিক ভাবে জমিদার মহাজনের নির্মম শোষণে আদিবাসী সমাজের কঙ্কালময় জীবনের ভাষ্যপাঠ হয়েছে মাত্র। এদের মধ্যে নেই কোনো অধিকারবোধ বা শ্রেণিবোধের প্রকাশ, নেই প্রতিবাদের কোনো দুঃসাহসী ভূমিকা। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক দোবরু পান্নার কাহিনি এসেছে। উপন্যাসটিতে দোবরু পান্না সাঁওতাল বিদ্রোহে লড়াই করেছেন। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তাঁর কোনো প্রতিবাদী ভূমিকা নেই। সমাজের ভয়াবহ দারিদ্র্য নিয়ে তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই, মাথাব্যথা নেই। তাঁর বক্তব্য — শহর অপেক্ষা জঙ্গালমহলেই তাঁরা ভালো রয়েছেন। বিভূতিভূষণ মূলত 'আরণ্যক' উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ মানসের দারিদ্র্যের ছবি এঁকেছেন, অর্থনৈতিক শ্রেণি বৈষম্যের ভেতরের সমস্যাকে কখনো প্রাধান্য দেননি। তিনি শোষক শোষিতের সম্পর্ক নির্ণয়ে এতোটুকু আগ্রহ বোধ করেন নি। অথচ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বিরাট

জায়গা কিন্তু আখ্যানে ছিল।

পরিশেষে বলা যায় আরণ্যক উপন্যাসে অনাবিল প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী আদিবাসীরা নিজেদের সুখ-দুঃখের, অভাব অনটনের গণ্ডিতেই আবর্তিত। সেখানে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা রাজগোঁড় বংশের দোবরু পান্না বা তাঁরই বংশধর জগরু পান্না ভানুমতিরা চরম দুঃখ দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করলেও কারো কোনো ব্যক্তিগত ও দলগত অভিযোগ নেই, প্রতিবাদ প্রতিরোধ নেই। উপন্যাসে প্রচলিত অলৌকিকতায় আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস সংস্কার, রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদির পরিচয় স্পষ্ট হলেও আদিবাসীরা তাঁদের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোনো স্বপ্ন দেখেন নি। উল্লেখ্য, আদিবাসীদের সভ্যতার ইতিহাস, তাঁদের প্রাক্-ইতিহাসের কথা, তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়, প্রাচীন ব্যবস্থা-সংস্কার-নিয়ম-রীতি-প্রথা-কুপ্রথা ইত্যাদি এবং শিক্ষা-দীক্ষা, অগ্রগতির ক্ষেত্রেও এগুলি যে আদিবাসীদের জীবনযাত্রাকে নানা ভাবে ব্যাহত করে চলেছে, তা ঔপন্যাসিক এড়িয়ে গেছেন বলেই আমাদের মনে হয়। না হলে আরণ্যক উপন্যাসে বিভূতিভূষণের আদিবাসী সমাজজীবনের বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরার মতো যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

তথ্য সূত্র :

১। 'গীতাঞ্জলি', বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, পৃ. ১৩১
২। 'উদ্ধৃতি অভিধান', ড. দিলীপকুমার মিত্র, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, পারুল প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৭৫
৩। 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ', সুবোধ দেবসেন, পুস্তক বিপণি, জানুআরি ২০১০ মাঘ ১৪১৬, পৃ. ১০
৪। ওই, পৃ. ১১
৫। 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১ম প্রকাশ ১৯৮৩, ৩য় মুদ্রণ ২০১০, পৃ. ৬
৬। 'স্মৃতিরেখা', বিভূতিভূষণ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২২
৭। 'আরণ্যক', বিভূতিভূষণ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ভাদ্র ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৪
৮। ওই, পৃ. ১১১
৯। ওই, পৃ. ১৫০
১০। ওই, পৃ. ২২
১১। ওই, পৃ. ৯১
১২। ওই, পৃ. ৯২

লেখক পরিচিতি :

ড. হরিচন্দ্র দাস : শিক্ষক, রথেরহাট উচ্চ বিদ্যালয় (দ্বাদশ)। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখক। মূলত রাজবংশী, রাভা ও আদিবাসী সমাজজীবন নিয়ে ও লোকসংস্কৃতি খুব আগ্রহের বিষয়। পাশাপাশি ভাওয়াইয়া গান চর্চা ও ভাওয়াইয়া লোকসংগীত নিয়ে গভীর গবেষণায় মগ্ন।